JETIR.ORG ISSN: 2349-5162 | ESTD Year : 2014 | Monthly Issue

JOURNAL OF EMERGING TECHNOLOGIES AND INNOVATIVE RESEARCH (JETIR)

An International Scholarly Open Access, Peer-reviewed, Refereed Journal

বাংলা পঞ্জিকার নানা কথা

অমরেশ বিশ্বাস, গবেষক, বিশ্বভারতী

সারসংক্ষেপ : বার, তিথি, নক্ষত্র, যোগ এবং করণ এই পাঁচটি বিষয়ের সংযোগে গঠিত বলে এর নাম পঞ্চাঙ্গ, বাংলাতে পঞ্জিকা। পঞ্জিকা বা পাঁজি হল বর্ষপঞ্জি। পারিবারিক এবং সামাজিক ধর্মীয় অনুষ্ঠানের কালনির্ণয় এবং সম্পাদনে পঞ্জিকার ভূমিকা অপরিসীম। পূর্বে গ্রহবিপ্রদের হাতে লেখা পঞ্জিকা নানা সামাজিক আচার-অনুষ্ঠানের মধ্যে তিথিক্রম বিধানের প্রধান উপায় ছিল। বাংলাতে উনিশ শতকের দ্বিতীয় দশকে মুদ্রিত পঞ্জিকার প্রচলন শুরু হয়। অন্য সমস্ত জনপ্রিয় প্রকাশনাকে পিছনে ফেলে দিয়ে পঞ্জিকা সমাজের সর্বস্তরের মানুষের কাছে পৌঁছে যায়। পঞ্জিকাতে জ্যোতিষবচনাদির পাশাপাশি আরও বিভিন্ন প্রয়োজনীয় তথ্য সংযোজিত হতে থাকে। পঞ্জিকার জনপ্রিয়তা লক্ষ্য করে ছোটো-বড়ো সব ব্যবসায়ীরা পঞ্জিকার পাতাতে তাদের পণ্যের বিজ্ঞাপন সজ্জিত করে। পঞ্জিকাতে উনিশশতক থেকে বাঙালি জীবনের অনেক তথ্য খুঁজে পাওয়া যাবে, বাংলা পঞ্জিকা বাঙালি সংস্কৃতির মূল্যবান দলিল।

সূচক শব্দ : পঞ্চাঙ্গ, তিথি, সূর্যসিদ্ধান্ত, দৈবজ্ঞ, চন্দ্রোদয় প্রেস, কৃষ্ণচন্দ্র কর্মকার, ‘নূতন পঞ্জিকা’, ভার্নাকুলার লিটারেচার সোসাইটি, অদৃক্‌সিদ্ধ পঞ্জিকা, গুপ্ত প্রেস ডাইরেক্টরী পঞ্জিকা, ‘বৃহৎ মহম্মদীয় পঞ্জিকা’

পঞ্জিকা নামক পুস্তকে বছরের প্রতিদিনের তারিখ, তিথি, পর্বদিন, শুভদিন ইত্যাদি থাকে। সংস্কৃত সাহিত্যে ও ভারতের অপরাপর রাজ্যে এটি পঞ্চাঙ্গ নামে পরিচিত। বার, তিথি, নক্ষত্র, যোগ এবং করণ—এই পঞ্চ অঙ্গ বিশিষ্ট বলে এটাকে পঞ্চাঙ্গ বলে।[১] বার বলতে চব্বিশ ঘন্টা ব্যাপী সময়কালের নির্দেশক। হিন্দু শাস্ত্রে একটি সূর্যোদয় থেকে আরেকটি সূর্যোদয়ের মধ্যবর্তী চব্বিশ ঘণ্টা সময়কে একটি বার বলা হয়। পূর্ণিমার পর প্রতিপদ থেকে আরেকটি পূর্ণিমা পর্যন্ত ব্যাপ্ত সময়কালের তিরিশভাগের একভাগ হল, একটি তিথি। একটি পূর্ণিমা থেকে একটি অমাবস্যা পর্যন্ত পনেরো দিন বিস্তৃত সময়কাল কৃষ্ণপক্ষ এবং ওই অমাবস্যার পরদিন থেকে পরবর্তী পূর্ণিমা পর্যন্ত সময়কে শুক্লপক্ষ বলে। কৃষ্ণপক্ষ এবং শুক্লপক্ষ মিলিয়ে মোট তিরিশ দিন এবং তিরিশটি তিথি। মানুষ যে নির্দিষ্ট পথে সূর্যের উদয় হওয়া এবং অস্ত যাওয়া প্রত্যক্ষ করে—সেটা সূর্যের আপাত গতিপথ বা ক্রান্তিবৃত্ত। সূর্যের উক্ত গতিপথের ধারে রয়েছে অসংখ্য দৃশ্যমান স্থির তারকা। এই তারকাগুলিকে

সাতাশটি পুঞ্জে ভাগ করে প্রত্যেকটি পুঞ্জের সবচেয়ে উজ্জ্বল তারাটিকে যোগতারা আখ্যা দিয়ে সেটা নক্ষত্র হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে। সাতাশটি পুঞ্জ তাই সাতাশটি নক্ষত্র, যেমন অশ্বিনী, ভরণী, কৃত্তিকা, রোহিণী, মৃগশিরা, আদ্রা, পুনর্বসু ইত্যাদি। তিথি এবং নক্ষত্রের মিলনের ফলে সৃষ্টি শুভলগ্নই হল যোগ। জ্যোতিষবিদ্যায় সাতাশরকমের যোগ রয়েছে যেমন বিষ্কুম্ভ, প্রীতি, আয়ুষ্মান, সৌভাগ্য, শোভন ইত্যাদি। করণ হল তিথির অংশবিশেষ। তিরিশটি তিথি থেকে এগারোটি করণের উদ্ভব হয়েছে। প্রতিটি করণের আবার পৃথক পৃথক অধিষ্ঠাত্রী দেবতা রয়েছে। যেমন ইন্দ্র-বব, যম-বিষ্ঠি, শ্রী-বর্ণিজ ইত্যাদি।[২]

বৈদিক যুগে এদেশে লৌকিক প্রয়োজনের থেকেও যজ্ঞানুষ্ঠানের জন্য কাল নির্ণয়ই ছিল কালবিভাগ বা বর্ষপঞ্জি রচনার প্রধান কারণ। বৈদিক যুগে ঋষিরা বিভিন্ন ঋতুতে আলাদা আলাদা যজ্ঞানুষ্ঠান করতেন তাই বছরের ঋতুবিভাগ সুষ্ঠুরূপে করার তাঁদের বিশেষ প্রয়োজন ছিল। তাঁরা সায়ন বা ঋতুনিষ্ঠ বৎসর গণনা করতেন। বছরকে উত্তরায়ন এবং দক্ষিণায়ন রূপে বিভক্ত করতেন। সূর্যের উত্তর এবং দক্ষিণ গতি পর্যবেক্ষণ করেই অয়ন বিভাগ করা হত। তাঁরা বছরকে তপঃ, তপস্যা, মধু, মাধব, শুক্র, শুচি, নভস্, নভস্য, ইষ, উর্জ, সহস্ ও সহস্য—এই বারোটি মাসে ভাগ করেন। এইপ্রকার কালবিভাগ যজুর্বেদের কালে প্রায় ১৫০০ খ্রিস্টপূর্বাব্দে রচিত হয়েছিল। বেদাঙ্গ-জ্যোতিষ কালে (১০০০ খ্রিস্টপূর্বাব্দ সন্নিহিত) তুলনামূলক বেশি বিজ্ঞানসম্মত পদ্ধতিতে পঞ্জিকা গণনা প্রবর্তিত হয়েছিল। এই পঞ্জিকার বছর আরম্ভ হত উত্তরায়ন দিবস থেকে এবং এটাতে বারোটি অমান্ত চান্দ্রমাস ব্যবহৃত হত। তিরিশটি তিথি এবং সাতাশটি নক্ষত্র গণনার ব্যবস্থাও ছিল। এই বেদাঙ্গ-জ্যোতিষ পঞ্জিকার মাধ্যমেই প্রায় ১৫০০ বছর ধরে ভারতে কালগণনা এবং যজ্ঞের কালনির্ণয় সাধিত হয়েছিল। মহাভারতে পাণ্ডবদের অজ্ঞাতবাসের সময় পূর্তির হিসাব করার সময়ও এই বেদাঙ্গ-জ্যোতিষ পঞ্জিকার গণনাপদ্ধতি ব্যবহার করা হয়।[৩]

এরপর খ্রিস্টীয় চতুর্থ বা পঞ্চম শতকে এদেশে সূক্ষ্ম গণনাপদ্ধতির উদ্ভব ঘটে। আর্যভট্ট, বরাহমিহির, ব্রহ্মগুপ্ত প্রমুখ জ্যোতির্বিদ এই পদ্ধতিকে জ্যোতির্বিদ্যার ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত করেন। তাঁরা সূক্ষ্ম কালগণনার সূত্রাদি প্রয়োগ করে প্রতিদিনের তিথি, নক্ষত্র প্রভৃতির পূর্তিকাল পঞ্জিকায় অন্তর্ভুক্ত করেন। সূর্যসিদ্ধান্ত গ্রন্থটি এ বিষয়ে অগ্রগণ্য। অতঃপর সূর্যসিদ্ধান্তকে ভিত্তি করেই এদেশে পঞ্জিকা গণনা হতে থাকে। দেশের বিভিন্ন স্থানে জ্যোতির্বিদগণ সূর্যসিদ্ধান্তের পদ্ধতিতে গণনা করে বার, তিথি, নক্ষত্র, যোগ ও করণযুক্ত প্রতিদিনের পঞ্চাঙ্গ তালপাতায় লিপিবদ্ধ করে বছর শুরুর পূর্বে গ্রামে গ্রামে গিয়ে শুনিয়ে আসতেন। আর এভাবেই গ্রামের ধর্মানুষ্ঠান পালনের কালনির্ণয় চলত।[৪]

পঞ্জিকার ব্যবসায়ী যারা বাড়ি বাড়ি ঘুরে মানুষকে পঞ্জিকাতে লেখা গ্রহের অবস্থান এবং ফলাফল বুঝিয়ে দিত তারা দৈবজ্ঞ নামে পরিচিত। তারা পঞ্জিকা হাতে নিয়ে পাড়ায় পাড়ায় ঘুরত এবং পারিশ্রমিক হিসেবে যা লাভ করত সেটাই ছিল তাদের জীবিকা। সম্পন্ন পরিবারগুলিতে বেতনভুক দৈবজ্ঞ থাকত। জন্মের পর নবজাতকের ভবিষ্যৎ কেমন হবে সেটা গণনা করে বলতে হত দৈবজ্ঞকে। যদি জীবনের ফলাফল লিখিতভাবে দেওয়া হত, তখন দক্ষিণা হিসেবে মোটা টাকা প্রাপ্য হত। তারপর থেকে দৈবজ্ঞকে জাতকের বিদ্যারম্ভ, উপনয়ন, বিবাহ, ব্যবসা, যাত্রা, রোগ প্রভৃতি সব জায়গাতেই শুভ-অশুভ কাল নির্দেশের জন্য আহ্বান করা হত। রোগাক্রান্ত হলে দৈবজ্ঞের গণনার দ্বারা ধার্য করা হত, কোন গ্রহের জন্য এই রোগ-অসুস্থতা হয়েছে। সেই গ্রহকে পরিতুষ্ট করতে পূজা বা কবচের ব্যবস্থাপত্র দিত দৈবজ্ঞরাই। মৃত্যু, শ্রাদ্ধ প্রভৃতির সময়ও দৈবজ্ঞদের পরামর্শের প্রয়োজন পড়ত। তাই হিন্দুর জীবনযাত্রা নির্বাহ দৈবজ্ঞকে এড়িয়ে কোনোমতে সম্ভব ছিল না।[৫] দৈবজ্ঞ এই গ্রহবিপ্রদের পঞ্জিকা নানা সামাজিক আচার-অনুষ্ঠানের মধ্যে তিথিক্রম বিধানের প্রধান উপায় ছিল। যোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধি তাঁর 'আত্মচরিত'-এ রাঢ় অঞ্চলে ছাপা পঞ্জিকা চালু হবার পূর্বের সময়কে বিবৃত করেছেন :

"নিকটে এক গাঁয়ে গ্রহাচার্য ছিল। নূতন বৎসরের প্রথমে, এবং পক্ষান্তে পাঁজি শুনিয়ে যেত; সিধা পেত। তালপাতায় লেখা পুথী গড়্ গড়্ করে পড়ে যেত, গিন্নিরা শুনে রাখতেন। কি বারে একাদশী, কি বারে অমাবস্যা, পূর্ণিমা, সপ্তমী, পঞ্চমী, ষষ্ঠী, অষ্টমী, কি বারে কি পূজা, কি ব্রত পনের দিনের পাঁজি মনে রাখতেন। পুরুতকেও জেনে রাখতে হত। তখন ছাপার পাঁজি ছিল না।"[৬]

বছরের প্রথমে দৈবজ্ঞের নিকট থেকে পঞ্জিকা শুনতে হয়, পঞ্জিকা শুনলে নাকি অশুভ দূরীভূত হয় :

বারো হরতি দুঃস্বপ্নং নক্ষত্রং পাপনাশনং।।
তিথির্ভবতি গঙ্গায়া যোগঃ সাগরসঙ্গমঃ।
করণং সর্ব্বতীর্থানি শ্রূয়তে দিনপঞ্জিকাঃ।।

পঞ্জিকা শুনলে বার ফলে দুঃস্বপ্ন নাশ, নক্ষত্রে পাপনাশ, তিথিতে গঙ্গাতুল্য ফল, যোগে সাগরসঙ্গমসদৃশ এবং করণে সব তীর্থফল লাভ হয়। দৈবজ্ঞেরা সাধারণ মানুষকে পঞ্জিকা সম্বন্ধে এসব কথা শোনাতেন, পঞ্জিকা শুনলে সব অশুভ দূর হয় তীর্থ দর্শনের পুণ্য লাভ হয়। পঞ্জিকা শ্রবণ বিষয়ে জ্যোতিষতত্ত্বধৃত বরাহ বচনে রয়েছে বার ও নক্ষত্র এরা দুঃস্বপ্ন এবং পাপনাশক। তিথি আয়ুস্করী, যোগ বুদ্ধিবর্ধক, চন্দ্র সৌভাগ্যপ্রদ, যারা প্রতিদিন পঞ্জিকা শ্রবণ করে তাদের এসব ফল লাভ হয়।[৭]

পূর্বে পঞ্জিকা হাতে লেখা হত। হাতে লেখা, অঙ্কের মতো সংখ্যা দিয়ে সাজানো বার, তিথি, নক্ষত্র প্রভৃতি সম্পর্কিত তথ্য। সেইসকল পঞ্জিকার লিখনপদ্ধতি নিম্নে দেওয়া হল :

৭	২	১
৪	১৬	৫৫
১৩	২৭	২৭
৯	৭	৮

প্রথম স্তম্ভে সংখ্যা হচ্ছে বার। এক্ষেত্রে ৭ হচ্ছে শনিবার, তার নীচে ৪ হচ্ছে চতুর্থী তিথি, আর তার নীচের সংখ্যাদ্বয় হচ্ছে ১৩ দণ্ড ৯ পল পর্যন্ত। দ্বিতীয় স্তম্ভে ২ অর্থে ভরণী নক্ষত্র, তার নীচের সংখ্যাদ্বয় হচ্ছে ১৬ দণ্ড ২৭ পল পর্যন্ত, আর তার নীচের সংখ্যা ৭ হচ্ছে বিষ্ঠিকরণ। তৃতীয় স্তম্ভে ১ অর্থে বিষ্কুম্ভ যোগ, তার নীচের দুই সংখ্যা হচ্ছে ৫৫ দণ্ড ও ২৭ পল পর্যন্ত। আর তার নীচে ৮ হচ্ছে মাসের তারিখ সংখ্যা।[৮]

মনে করা হয় বাংলাতে পঞ্জিকা প্রচলনের প্রথম প্রেরণা স্মার্ত রঘুনন্দন। রঘুনন্দন তৎকালীন সময়ে বিদেশি প্রভাব থেকে হিন্দু সমাজকে মুক্ত রাখতে নতুন করে কঠোরভাবে নানা ধর্মীয় বিধি-নিষেধ প্রবর্তন করেন। এইসব নির্দেশ স্মৃতিশাস্ত্রে লেখা থাকলেও, সেটা জনসাধারণের জন্য সর্বদা ব্যবহার উপযোগী নয়। তাই পঞ্জিকার মাধ্যমে এসব রীতিনীতি, দিনক্ষণ এবং লগ্নের শুভ-অশুভ ইত্যাদির বিচার সবার কাছে সহজলভ্য হয়ে ওঠে। তারপর থেকে যারা সংস্কৃতে পণ্ডিত এবং স্মৃতিশাস্ত্রে অভিজ্ঞ ব্যক্তি, পঞ্জিকা সংকলনে উদ্যোগী হন। তবে বিভিন্ন স্থানের পণ্ডিতদের সংকলিত পঞ্জিকায় স্বাভাবিকভাবে পার্থক্য দেখা দিত।[৯] ইংরেজরা এদেশের শাসনব্যবস্থা পরিচালনার ক্ষেত্রে প্রথমদিকে দেশীয় তারিখ অনুসারে নানা অনুষ্ঠান ও রাজকার্য নির্বাহ করত। কিন্তু বিভিন্ন ব্যক্তির দ্বারা সংকলিত পঞ্জিকায় প্রায়শই তারিখের রকমফের ঘটত এবং রাজকার্য বিঘ্নিত হত। তাই সরকার অনুরোধ করেন রাজা কৃষ্ণচন্দ্রকে একটি সর্বসম্মত পঞ্জিকা সংকলনের জন্য। কৃষ্ণচন্দ্র বিশিষ্ট পণ্ডিতদের আমন্ত্রণ করে একটি আলোচনা সভার মাধ্যমে পঞ্জিকা সংকলনের একটি সর্বসম্মত বিধি তৈরি

করেন। এই বিধি অনুসারেই পরবর্তীকালে পঞ্জিকা সংকলিত হয়। কৃষ্ণচন্দ্র প্রতিবছর পণ্ডিত রামচন্দ্র বিদ্যানিধিকে দিয়ে পঞ্জিকা সংকলন করানোর পর, তার কতগুলি প্রতিলিপি বিশিষ্ট পণ্ডিত, সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি ও স্থানীয় নবাবদের বিতরণ করতেন। এই জন্যই রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের অনুমোদন সম্বন্ধীয় কথা প্রথমদিকের পঞ্জিকাগুলিতে লক্ষ্য করা যায়।[১০]

১১৯৪ বঙ্গাব্দের একটি সরকারি নোটিশে ছুটির তালিকা থেকে জানতে পারা যায়, নিম্নলিখিত দিনগুলিতে সরকারি কার্যালয় একেবারে বন্ধ থাকত :

> রথযাত্রা ১ দিন, পুনর্যাত্রা ১ দিন, রাখীপূর্ণিমা ১ দিন, জন্মাষ্টমী ২ দিন, দুর্গাষ্টমী ২ দিন, মহালয়া ১ দিন, দুর্গাপূজা ৫ দিন, দেওয়ালী ৩ দিন, উত্থান একাদশী ২ দিন, তিলওয়া সংক্রান্তি ১ দিন, বসন্ত পঞ্চমী ১ দিন, শিবরাত্রি ২ দিন, হোলি ৫ দিন, বারুণী ১ দিন, চড়ক পূজা ১ দিন, রামনবমী ১ দিন।... প্রয়োজন হলে নিম্নলিখিত দিনসমূহেও ছুটি পাওয়া যাবে—অক্ষয় তৃতীয়া ১ দিন, নৃসিংহ চতুর্দশী ২ দিন, জ্যৈষ্ঠ মাসে দশমী-একাদশী ২ দিন, স্নানযাত্রা ১ দিন, শয়ন একাদশী ১দিন, অরন্ধন ১ দিন, গণেশ পূজা ১ দিন, অনন্তব্রত ১ দিন, বুধনবমী ১ দিন, নবরাত্রি ১ দিন, লক্ষ্মীপূজা ১ দিন, ভ্রাতৃ দ্বিতীয়া ১ দিন, অন্নকুট যাত্রা ১ দিন, কার্তিক পূজা ১ দিন, জগদ্ধাত্রী পূজা ১ দিন, রাসযাত্রা ১ দিন, অগ্রহায়ণ নবমী ১ দিন, রটন্তী অমাবস্যা ২ দিন, মৌনী সপ্তমী ১ দিন, ভীমাষ্টমী ১ দিন ও বাসন্তী পূজা ৪ দিন।[১১]

মুদ্রিত পঞ্জিকার প্রচলন শুরু হয় উনিশ শতকের দ্বিতীয় দশকে। প্রথম ছাপা পঞ্জিকার পরিচয় পাওয়া গিয়েছে—পঞ্জিকাটি ছাপানো হয়েছিল ১৮১৮ খ্রিস্টাব্দে। জনৈক রামহরি পঞ্জিকাটি প্রকাশ করেছিলেন যার পৃষ্ঠাসংখ্যা ছিল ১৩৫ এবং একটি ছবি ছিল, যেখানে দেখান হয়েছে সূর্যের রথ টেনে নিয়ে যাচ্ছেন এক দেবী। পরের বছর অর্থাৎ ১৮১৮-১৯ খ্রিস্টাব্দে (বাংলা ১২২৫ সন) যে পঞ্জিকাটি পাওয়া গিয়েছে, সেটা জাতীয় গ্রন্থাগারে রাখা আছে। পঞ্জিকাটির সংকলক ছিলেন জোড়াসাঁকোর বাসিন্দা দুর্গাপ্রসাদ। তাঁর পৃষ্ঠপোষক ছিলেন রামহরি নামক এক ব্যক্তি। দুর্গাপ্রসাদ পঞ্জিকা সংকলন বিষয়ে বলেছেন তিনি সম্পদ লাভের আশায় পঞ্জিকা সংকলন করেছেন। এই পঞ্জিকাতে একটি ছবি ছিল, সূর্যগ্রহণের।[১২] পঞ্জিকার শেষে সংকলকের যে নিবেদন অংশ ছিল এখানে উদ্ধৃত করা হল :

> ভবসিন্ধু যে অপার তাহে হয়ে কর্ণধার জীবগণের করিছেন নিস্তার। সজীবনে তারি নাম মোনে মনন অভিশ্রাম কহিব কিছু না করি বিস্তার। ভক্তবৎসর গুণ ভক্তিপথে জো নিপুণ মুক্তি দেন উক্তি আছে তার শ্রীযুক্ত রামহরি নাম হৃদয়ে মুখ্ততে ধাম ত্রিজগতে তিনি সারত সার। সেই পদ সেবা করি সম্পদ বাসনা করি করিলাম পঞ্জিকা প্রকাষ। জোড়াসাঁকো মমঃ ধাম দিয দুর্গাপ্রসাদ নাম দুর্গাযদী পুরাণ অভিলাষ। নবদ্দিপের মতে মত তাহে নহেরণ্যমত এমত জানিবে সকলে। জ্ঞাতো হেও যোগ বার আর যত আছে তার ভাষায় রচিলাম দেখে মূলে। গ্রহস্ত আশ্রমের ফল জানিতে হয় এ সকল ফলাফল যে গ্রহর যে দীনে। অক্লেসে ক্লেষ নাই পঞ্জিকা সকলের ঠাই দেখিবেন যখন হবে মনে। আর কীছু বলি স্থূল যদী থাকে ইতে ভুল আমি করি মূলের প্রমাণে। আমার ভাষার ত্রুটি থাকে যদি কোটি ২ শুর্দ্ধ হবে সাধু সন্নিধানে।[১৩]

সমাজের সর্বস্তরের মানুষের কাছে পঞ্জিকার গুরুত্ব উপলব্ধি করে রেভারেন্ড জেমস লঙ প্রথম পঞ্জিকা বিষয়ে আলোচনা করেন। তাঁর লেখা থেকে জানা যায় ১৮১৮ সনের রামহরির পঞ্জিকা সম্পর্কে, ১৮২৪ সনের কলকাতা নতুন পঞ্জিকা, ১৮২৫ সনে বিশ্বনাথ দেবের পঞ্জিকা, ১৮৩৫ সনের গোবর্ধন শর্মার পঞ্জিকা, ১৮৩৬ সনের মেদিনীর পঞ্জিকা এবং মাধবমোহন দাসের পঞ্জিকা, ১৮৪০ সনের পঞ্জিকা, ১৮৪৬-৫২ সনের ট্রাক্ট সোসাইটির বাৎসরিক পঞ্জিকা, ১৮৪৭-৫০

সনের খ্রিস্টীয় পঞ্জিকা এবং কোনের পঞ্জিকা, কাশীপুর পঞ্জিকা, গোপাল চন্দ্রের পঞ্জিকা, শ্রীরামপুর পঞ্জিকা, রামকেশরের পঞ্জিকা, সিদ্ধেশ্বর ঘোষের পঞ্জিকা, ভার্নাকুলার লিটারেচার সোসাইটির পঞ্জিকা প্রভৃতি সম্পর্কে জানা যায়।[১৪] তিনি বলেছেন কলকাতায় পঞ্জিকা বিক্রি হয়েছে অন্তত ১ লাখ ৩৫ হাজার। পঞ্জিকার এত জনপ্রিয়তার কারণ রূপে বলেছেন তখন বাঙালির জীবনে পঞ্জিকা পান-তামাকের মতোই অপরিহার্য ছিল। সে সময়ে পঞ্জিকা বিক্রি করা হত ছাপাখানা থেকেই। নতুন বছর শুরু হওয়ার কিছু আগে থেকেই মুটেরা ঝাকা ভর্তি করে পঞ্জিকা নিয়ে রাস্তায় রাস্তায় ফেরি করে বেড়াত। আর ঝাকা খালি করতে সময় বেশি লাগত না।[১৫]

১২২৫ সনের জনৈক রামহরির পঞ্জিকা এবং ১২২৫ সনে জোড়াসাঁকো নিবাসী দুর্গাপ্রসাদের পঞ্জিকা প্রকাশের পর থেকে মানুষের পঞ্জিকার প্রতি আকর্ষণ দেখে আরও একাধিক পঞ্জিকা বছর বছর ছাপা হতে থাকে। ১২২৭ সনে প্রকাশিত পঞ্জিকাটি বিশেষ একটি কারণের জন্য উল্লেখযোগ্য। এই পঞ্জিকাতে প্রতি বছরের এবং মাসের প্রথমে সংক্রান্তি ঠাকুরের ছবি দেওয়া শুরু হয়। যে রীতি অধুনা সময়েও প্রচলিত। সে সময়ে প্রকাশিত পঞ্জিকাগুলির মধ্যে ১৮২৪ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত পঞ্জিকাটি আকারে সবচেয়ে বড়ো ছিল, পৃষ্ঠার সংখ্যা ১৬৮। ১৮২৫ খ্রিস্টাব্দে বিশ্বনাথ দেব কর্তৃক প্রকাশিত পঞ্জিকাটি সবচেয়ে দামি ছিল, মূল্য ১ টাকা।[১৬]

'ফ্রেন্ড অফ ইন্ডিয়া'র লেখা থেকে জানা যায় গ্রামাঞ্চলে পঞ্জিকা মুদ্রণের বিষয়ে। নদীয়ার অগ্রদ্বীপের নিকটস্থ গ্রামে গঙ্গাধর নামে এক ব্যক্তি একটি পঞ্জিকা ছাপিয়ে প্রকাশ করেছিলেন। গঙ্গাধরের নিজস্ব মুদ্রাযন্ত্রে পঞ্জিকাটি ছাপা হয়েছিল। উক্ত পঞ্জিকাটি উৎসর্গ করা হয়েছিল কৃষ্ণনগরের বিদ্যোৎসাহী রাজার নামে। ১২৪২ সনে চন্দ্রোদয় প্রেস থেকে 'নূতন পঞ্জিকা' নামক পঞ্জিকাটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। পূর্বে প্রকাশিত পঞ্জিকাগুলির থেকে এটি মুদ্রণ সুষমায় বেশ উন্নত মানের হয়েছিল। মুদ্রণের সৌষ্ঠবের পাশাপাশি ছিল তথ্যের প্রাচুর্য, জ্যোতিষ বচন, দৈনন্দিন জীবনের প্রয়োজনীয় তথ্য, বারো মাসের রাশিফল, পুরাণ ও ইতিহাসের মিশ্রণে এদেশের ঐতিহাসিক এবং ভৌগোলিক পরিচয়।[১৭]

হিন্দু সমাজে পঞ্জিকার প্রভূত প্রচলন দেখে খ্রিস্টান সমাজেও ব্যবহারের জন্য কলকাতার ট্রাক্ট সোসাইটি এবং চার্চ অব ইংল্যান্ডের যৌথ উদ্যোগে ১৮৪৯ খ্রিস্টাব্দে একটি খ্রিস্টীয় পঞ্জিকা প্রকাশিত হয়।[১৮]

১২৫১ সনে বঙ্গবাসী প্রকাশনার দ্বারা 'পুরাতন পঞ্জিকা' নামে এক পঞ্জিকা প্রকাশিত হয়। নামকরণের ক্ষেত্রে স্বতন্ত্রতা লক্ষ্য করার মতো। প্রথম এই সংখ্যায় বিজ্ঞাপনের বহুলতা লক্ষ্য করা যায়। শুরুতেই বঙ্গবাসী পুস্তক-বিভাগ দ্বারা ১ থেকে ৩৭ পৃষ্ঠা পর্যন্ত নানা বইয়ের বিজ্ঞাপন। প্রতিটি বইয়ের বিজ্ঞাপন অংশে বই সম্পর্কিত সংক্ষিপ্ত বর্ণনা উৎসাহী পাঠককে বই নির্বাচনে সাহায্য করেছিল। খুব সংক্ষিপ্তভাবে প্রতিদিনের বর্ণনা ছিল।[১৯]

পঞ্জিকার আলোচনাতে কৃষ্ণচন্দ্র কর্মকারের নাম বিশেষ উল্লেখের দাবি রাখে। 'চন্দ্রোদয় প্রেস' থেকে প্রকাশিত 'নূতন পঞ্জিকা'কে তিনি চিত্তাকর্ষক ও জনপ্রিয় করে তুলেছিলেন। পঞ্জিকাতে প্রাত্যহিক লগ্নমুহূর্ত থেকে অন্নপ্রাশন, বিদ্যারম্ভ, চূড়াকরণ এবং বিবাহের দিন নির্ধারণের সঙ্গে পর্ব, ছুটির দিন এবং বৈষ্ণবদের পর্ব দিনের উল্লেখ থাকত। সেই সঙ্গে রাশিফল, কালবেলা এবং জন্মলগ্নের শুভ-অশুভ বর্ণনা এবং বৈষয়িক কাজের জন্য জরুরি স্টাম্প ও ডাক মাশুলের বিবরণও ছিল। "নবদ্বীপাধিপতি শ্রীল শ্রীযুক্ত গিরিশচন্দ্র নৃপতেরনুজ্ঞয়া শ্রীগোপালচন্দ্র ভট্টাচার্য্যকর্তৃক" রচিত কৃষ্ণচন্দ্র কর্তৃক প্রকাশিত, এই 'নূতন পঞ্জিকা'টির প্রধান দিক হল এটি বহু পূর্ণ পৃষ্ঠা কাঠখোদাই চিত্রে সজ্জিত। হিন্দুদের প্রধান প্রধান দেবদেবী, রাসযাত্রা, চড়ক, রথযাত্রা প্রভৃতি ধর্মানুষ্ঠান ছিল কাঠখোদাই ছবিগুলির বিষয়। উল্লেখ্য তাঁর প্রকাশিত পঞ্জিকায় প্রতিটি কাঠখোদাই ছবির নীচে স্পষ্টভাবে মুদ্রিত 'শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র কর্মকারের কৃত'।[২০]

কৃষ্ণচন্দ্রের পঞ্জিকার জনপ্রিয়তা দেখে প্রলুব্ধ হয়েছিল বিদেশী প্রকাশক 'সেন্ডারস অ্যান্ড কোন্‌স'। তাঁরা পঞ্জিকার নামকরণও করেছিল কৃষ্ণচন্দ্রের অনুকরণে 'নূতন পঞ্জিকা'। পঞ্জিকার সর্বাঙ্গেও ছিল কৃষ্ণচন্দ্রের মুদ্রণ এবং অলংকরণের প্রভূত অনুকরণ। কৃষ্ণচন্দ্রের পঞ্জিকার মতোনই অনেকগুলি পূর্ণ পৃষ্ঠা কাঠখোদাই চিত্রে শোভিত। প্রতিটি কাঠখোদাই চিত্র তারা এদেশীয় শিল্পীদের দ্বারাই অংকন করিয়েছিল কৃষ্ণচন্দ্রের অনুকরণে। 'সেন্ডারস অ্যান্ড কোন্‌স' কোম্পানির এই পঞ্জিকাটি যে কৃষ্ণচন্দ্রের পঞ্জিকার অনুসরণে, তার স্বীকৃতিও লিপিবদ্ধ করা হয়েছিল পঞ্জিকাটির সূচনাপত্রে।[২১] উক্ত পঞ্জিকায় ১২৫৪ বঙ্গাব্দে বিজ্ঞাপনে লেখা হয় :

> এই বিজ্ঞাপন পত্র দ্বারা সর্বসাধারণ লোকদিগের জ্ঞাপন করা যাইতেছে যে আমরা এই পঞ্জিকার অনুষ্ঠান কালিন কহিয়াছিলাম যে শ্রীরামপুরের পঞ্জিকাপেক্ষা অতি মনোহর রূপে মুদ্রিত করিব, ইহা মনস্থ করিয়া ছবি, বর্ডার অর্থাৎ পৃষ্ঠার চতুর্পার্শ্বের ফুল আর ২ দ্রব্যের নিমিত্ত বিলাতে পত্র লিখিয়াছিলাম। কিন্তু ঐ সকল দ্রব্য বিলাত হইতে আসিবার অনেক বিলম্ব দেখিয়া, বর্তমান বৎসর এতদ্দেশীয় ছবি সকল গ্রহণ করিলাম। সংপ্রতি বিলাত হইতে ঐ সকল দ্রব্য এবং বিলাতি কাগজ আসিয়াছে তাহা আগামি বৎসরের পঞ্জিকায় মুদ্রিত করা যাইবেক।[২২]

তবে সবচেয়ে রুচিসম্মত পঞ্জিকা প্রকাশ করেছিল ভার্নাকুলার লিটারেচার সোসাইটি। ১২৬২ এবং ১২৬৩ পরপর দু'বছর এই পঞ্জিকা প্রকাশিত হয়। তাদের কাগজ ভালো, ছাপা একেবারে পরিচ্ছন্ন এবং বিবিধ তথ্যে পূর্ণ ছিল। তবে হিন্দুর নানারকম সংস্কার সম্পর্কে বিশেষ কিছু কথা এবং দেবদেবীর ছবির আধিক্য না থাকায় জনপ্রিয় হতে পারেনি। পঞ্জিকাটির পৃষ্ঠা সংখ্যা ছিল ২০০ এবং দাম ছিল মাত্র ৪ আনা।[২৩] প্রকাশনার প্রথম বছরে পঞ্জিকাটির দুটি ভাগ ছিল। প্রথম ভাগ আসলে দিনপঞ্জি এবং এর বিষয়গুলি ছিল ১৮৫৫-৫৬ সালে বিভিন্ন রাজস্ব এলাকার ক্ষেত্রে লাটের খাজনা দাখিলের শেষ দিন, ছুটির তালিকা। দ্বিতীয় ভাগ আরও অনেক জ্ঞাতব্য তথ্যে পরিপূর্ণ ছিল। প্রথমেই বাংলার ৩০৯ টি বিখ্যাত মেলার জেলাভিত্তিক বিবরণ। জানা যায় উত্তরবঙ্গের অনেক মেলায় হাতি, ঘোড়া আমদানি হত। ভবানীপুর এবং খিদিরপুরের মেলা প্রসিদ্ধ ছিল কাপড়, পুতুল এবং মিষ্টান্নের জন্য। এরপর আছে কৃষিকাজের বিবরণ, কোন মাসে কোন শস্য চাষ হবে সে বিষয়ে বিবরণ। কোম্পানি এবং সিক্কা টাকার বিনিময় হারের তালিকা। মুন্সেফ এবং উকিল পদপ্রার্থীদের জন্য বিস্তৃত বিবরণ সমন্বিত প্রস্পেক্টাস। রেল সম্বন্ধে, যাত্রীদের কর্তব্য সম্বন্ধে অনেক তথ্য, যেমন হাওড়া থেকে বর্ধমান তৃতীয় শ্রেণির ভাড়া ছিল এক টাকা। রানীগঞ্জের ভাড়া এক টাকা চৌদ্দ আনা। স্টেশনের বাংলা প্রতিশব্দ হিসেবে ব্যবহার করা হয়েছে 'আড্ডা'। ভারতবর্ষের প্রধান সকল রোগের বিবরণ এবং তাদের প্রতিকারের ব্যবস্থা। মাথাব্যথা এবং পেট ব্যথায় জোঁক লাগানোর ব্যবস্থার কথা বলা হয়েছে।[২৪]

১২৭৬ সনে 'গুপ্ত প্রেস ডাইরেক্টরী পঞ্জিকা' প্রকাশ করেন দুর্গাচরণ গুপ্ত। বাংলা পঞ্জিকার সূত্রপাত থেকে যে যে পঞ্জিকা শত বছরের অধিক সময় ধরে প্রকাশিত হয়ে চলেছে গুপ্ত প্রেস ডাইরেক্টরী পঞ্জিকা তাদের মধ্যে প্রাচীন। এই প্রয়াস ডাইরেক্টরি ধারণাকে আজও প্রচলিত রেখেছে।[২৫] ১২৮৯ সনে শ্রী বেণীমাধব ভট্টাচার্য্য দ্বারা মুদ্রিত এবং প্রকাশিত হয় 'কলেজ পঞ্জিকা এবং বৃহৎ ডাইরেকটরি'। এখানে আলাদা আলাদা ডাইরেক্টরি সংযোজিত হয়েছে। শিক্ষা বিষয়ক এবং প্রশাসনিক তথ্য প্রথম ডাইরেক্টরিতে। দ্বিতীয় ডাইরেক্টরি মফঃস্বল সংক্রান্ত ও তৃতীয় ডাইরেক্টরিতে ব্যবসা-বাণিজ্য সংক্রান্ত যাবতীয় তথ্য পরিবেশিত। ১২৯০ সনে প্রকাশিত হয় 'পি এম বাক্‌চির ডাইরেক্টরী' পঞ্জিকা, কিশোরী মোহন বাক্‌চি যার প্রতিষ্ঠাতা। ১২৯৬ সনের পি এম বাক্‌চির ডাইরেক্টরী পঞ্জিকা বহুল পরিমাণ তথ্যের সমাবেশ ঘটিয়ে অন্য মাত্রা যোগ

করেছিল বাংলা পঞ্জিকার ইতিহাসে। পঞ্জিকাটির ছিল চারটি খণ্ড। প্রথম খণ্ডের বিষয় ছিল জ্যোতিষবচনসমূহ এবং দ্বিতীয়, তৃতীয় ও চতুর্থ খণ্ডে—মফঃস্বল ডাইরেক্টরি, কলকাতা স্ট্রিট ডাইরেক্টরি এবং যান ডাইরেক্টরি সংযোজিত হয়েছিল।[২৬]

সূর্যসিদ্ধান্ত অনুযায়ী যে গ্রহের অবস্থান পাওয়া যায়, সেটা মহাকাশে দৃশ্যমান গ্রহ-অবস্থানের সঙ্গে মেলে না। তাই এই গণনালব্ধ তথ্যসমূহ কখনওই দৃক্‌সিদ্ধ বা শুদ্ধ হয় না। ভারতবর্ষের সনাতনপন্থীরা এই সূর্যসিদ্ধান্ত গ্রন্থের উপর ভিত্তি করে যে গণনাপদ্ধতির সূত্রপাত করেন, সেই পদ্ধতি-নির্ভর পঞ্জিকা অশুদ্ধ পঞ্জিকা বা অদৃক্‌সিদ্ধ পঞ্জিকা নামে পরিচিত। জ্যোতির্বিজ্ঞানের আধুনিক পদ্ধতি অনুযায়ী চন্দ্র এবং গ্রহের দৈনন্দিন অবস্থান যে পঞ্জিকাতে লিপিবদ্ধ করা হয় তাকে দৃক্ সিদ্ধ বা শুদ্ধ পঞ্জিকা বলে। উক্ত পঞ্জিকাতে লিপিবদ্ধ করা চন্দ্র ও গ্রহের অবস্থানের সঙ্গে রাত্রের আকাশে দূরবীনে দেখা চন্দ্র ও গ্রহের অবস্থানের কোনো পার্থক্য থাকে না। ১২৯৭ বঙ্গাব্দে দৃক্‌সিদ্ধ পঞ্জিকার অভাব পূরণ করতে শ্রী মাধবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় 'বিশুদ্ধ সিদ্ধান্ত পঞ্জিকা' প্রকাশ করেন। তিনি ইংল্যান্ডের নাবিক পঞ্জিকা Nautical Almanac অনুসারে এই কাজ সম্পন্ন করেছিলেন।[২৭]

সে সময় প্রচলিত কোনো কোনো পঞ্জিকায় মুসলমান সমাজের জন্য প্রযোজ্য সন, মাস, তারিখ বা পর্বের উল্লেখ থাকলেও মুসলমানদের চাহিদা তাতে মেটেনি। সেইজন্য ১২৯৯ সনে মুসলমানী পঞ্জিকা 'বৃহৎ মহম্মদীয় পঞ্জিকা' প্রকাশিত হয়। ১৩২০ সনের এই 'বৃহৎ মহম্মদীয় পঞ্জিকা'র সংকলকের নাম জানা যায়, মোহাম্মদ রেওয়াজুদ্দীন আহমদ। কলকাতার জন্য এই পঞ্জিকার দাম ছিল ৯ আনা এবং মফঃস্বলের জন্য ৪ আনা। ভূমিকায় সংকলক বলেছিলেন :

> হে পরম কারুণিক দয়াময় আল্লাহ তালা! তোমার সৃজিত দিন-রাত্রি, ঋতু-পক্ষ, মাস-তিথি ও অন্যান্য জ্ঞাতব্য বিষয় এবং তোমার উপাসনা ও আরাধনার নিয়ম পদ্ধতি সংক্ষেপে বর্ণনা করিব। মুসলমানগণ পৌত্তলিকতা-মূলক পঞ্জিকাদি ব্যবহার করিতেছে, ফলিত জ্যোতিষে বিশ্বাস স্থাপন করিয়া, তোমার আদেশের বিপরীতাচরণ করিতেছে; এ ক্ষুদ্র দীন-হীন অকিঞ্চন তাহাদিগকে সেই ভ্রান্ত মত হইতে—তোমার অভিলষিত ও অনুমোদিত ন্যায়পথ প্রদর্শন জন্য, এই কার্য্যে প্রবৃত্ত হইল; অতএব তুমি এ ক্ষুদ্র হৃদয়ে বল প্রদান কর। তোমা ব্যতীত উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইবার কিছুমাত্র সম্ভাবনা নাই। এই পুস্তকে যদি ভ্রম থাকে, কোন ধর্মবিগর্হিত কথা সন্নিবিষ্ট হইয়া থাকে, তোমার এ দীন অভাজন "বান্দা"কে তজ্জন্য ক্ষমা করিবে।[২৮]

১৩০৬ সনে প্রকাশিত হয় বটকৃষ্ণ পাল এন্ড কোম্পানীর 'বিশুদ্ধ পঞ্জিকা'। কথিত হয় শ্রী পাল মহাশয় ব্রাহ্মণদের ভেতরে বিনামূল্যে পঞ্জিকা বিতরণের জন্য পঞ্জিকা প্রকাশের উদ্যোগ নেন। কিন্তু তার সমালোচকেরা অন্য কথা বলেন, দ্বিজভক্তি নয়, এই উদ্যোগের মূল প্রেরণা ছিল ব্যবসায়িক বুদ্ধি। বটকৃষ্ণ পালের ১৩২৮ সনের পঞ্জিকাতে তাঁর ব্যবসার ১৫টি বিভাগের বিজ্ঞাপনের জন্য পঞ্জিকার প্রথম দিকের ৩৪ পৃষ্ঠা ব্যবহার করেন এবং চৈত্র সংক্রান্তির পর শেষ ১৬ পৃষ্ঠাও ব্যবহার করেন একই কারণের জন্য। এছাড়া বৎসরের প্রতিদিনের জন্য নির্দিষ্ট পৃষ্ঠার নিচে রুল ব্যবহার করে বিজ্ঞাপন দেওয়ার রীতি তিনি প্রবর্তন করেন।[২৯]

পঞ্জিকার জনপ্রিয়তা সর্বস্তরের মানুষের মধ্যে থাকায়, বহু প্রকাশক পঞ্জিকা প্রকাশনার কাজে হাত দিয়েছিলেন। ঢাকার লালমোহন সাহা, তাঁর মালিক বটকৃষ্ণ মহাশয়ের প্রকাশিত পঞ্জিকা দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়ে প্রকাশ করেন 'সারস্বত পঞ্জিকা' (১৩০৭)। ১৩২৫ সনে প্রকাশিত হয় 'পূর্ণচন্দ্র ডাইরেক্টরী পঞ্জিকা'। নগেন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত কবিরাজের আয়ুর্বেদীয় ঔষধালয়ের আয়ুর্বেদ সম্পর্কিত, বিভিন্ন তথ্য সম্বলিত শাস্ত্রীয় এবং সুবিখ্যাত ঔষধ সমূহের মূল্য নির্ধারণ পুস্তক এবং ১৩২৬ সালে 'কেশরঞ্জন পঞ্জিকা' প্রকাশ করেন। শ্রী নিরাপদ দেবশর্ম্মা কর্তৃক ১৩২৭ সনে প্রকাশিত হয় 'নববিভাকর পঞ্জিকা ও

ডাইরেক্টরী'। ১৩২৯ সনে 'বঙ্গবাসী পঞ্জিকা ও ডাইরেক্টরী' প্রকাশিত হয়। একই বছরে 'বরিশালের পঞ্জিকা' নামে আরও একটি পঞ্জিকা প্রকাশিত হয়। ১৩৫৮ সনে 'জগৎজ্যোতি পঞ্জিকা ও ডাইরেক্টরী' প্রকাশিত হয়। ১৩৬০ সনে প্রকাশিত হয় 'নবগ্রহ পঞ্জিকা'। শ্রী ধনঞ্জয় দে প্রকাশ করেন 'ভারতমাতা গৃহ পঞ্জিকা' ১৩৬৩ সনে। শ্রী বেণীমাধব শীল প্রকাশ করেন 'বেণীমাধব ফুল পঞ্জিকা'।[৩০]

সূর্যসিদ্ধান্ত গ্রন্থটি যে সময়ে রচিত হয়েছিল সে আমলে এই গ্রন্থ অনুসারে গ্রহ-অবস্থান গণনা অনেকটা নির্ভুল হত। কিন্তু অধুনা সময়ে এই গ্রন্থের ভিত্তিতে গণনাতে অনেক ভুল দেখা যায়। যে সমস্ত পঞ্জিকা সূর্যসিদ্ধান্ত গ্রন্থকে মেনে চলে, সেখানে পঞ্জিকায় লেখা গ্রহ-অবস্থান এবং মহাকাশে প্রত্যক্ষ গ্রহ-অবস্থানে পার্থক্য লক্ষ্য করা যায়। পঞ্জিকার প্রধান অঙ্গ হল তিথি। তিথি সম্বন্ধে অদৃক্‌সিদ্ধ পঞ্জিকা যে তত্ত্বের উপর নির্ভর করে তা হল 'বাণবৃদ্ধি রসক্ষয়', এর অর্থ হল তিথিবৃদ্ধি ৬৫ দণ্ডের বেশি হবে না এবং তিথি হ্রাস ৫৪ দণ্ডের কম হবে না। কিন্তু এর জন্য প্রাচীনের সঙ্গে বর্তমানের গণনার পার্থক্য হয় ৬ ঘন্টার কাছাকাছি। এই সমস্যা নিরসনের জন্য ভারত সরকার বিজ্ঞানী মেঘনাদ সাহার নেতৃত্বে গঠন করে 'পঞ্জিকা সংস্কার কমিটি' ১৯৫২ খ্রিস্টাব্দে। সেই অনুযায়ী ১৯৫৭ খ্রিস্টাব্দ থেকে বারোটি ভারতীয় ভাষায় বিশুদ্ধ গণনা সমন্বিত ও সর্বপ্রকার বাহুল্য বর্জিত 'রাষ্ট্রীয় পঞ্চাঙ্গ' প্রকাশিত হয়।[৩১]

বাংলা পঞ্জিকা মুদ্রিত হয়ে প্রকাশনার কিছুকালের মধ্যেই অন্যান্য জনপ্রিয় প্রকাশনাকে পিছনে ফেলে দিয়েছিল। পঞ্জিকার এই জনপ্রিয়তা বিত্তবান সম্প্রদায়কে আগ্রহী করেছিল পঞ্জিকা প্রকাশনাতে। ফলশ্রুতি রূপে দেখা গেল মুদ্রিত পঞ্জিকার সংখ্যাধিক্য। সংখ্যাধিক্যের কারণে পঞ্জিকা প্রকাশকদের মধ্যে তৈরি হয় প্রতিযোগিতার মনোভাব। উন্নত কাগজ, শৈল্পিক উপস্থাপনা, মুদ্রণ সৌষ্ঠবের মাধ্যমে পঞ্জিকাকে উন্নত করার পাশাপাশি, খুব সচেতনভাবেই প্রকাশকরা প্রতিযোগীদের টেক্কা দিতে পঞ্জিকার মূল আলোচ্য বিষয় জ্যোতিষ-বচনাদির সঙ্গে যুক্ত করেছিলেন বিভিন্নরকম বিষয়, যা সমাজসংস্কার এবং একই সঙ্গে সমাজ গঠনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিল। পঞ্জিকা প্রকাশকরা এইসব গুরুত্বপূর্ণ তথ্যপঞ্জি গ্রামে-গঞ্জে শহরে মানুষের নিকটে পৌঁছে দিয়ে তাদের এক উন্নয়ন কর্মসূচিতে অন্তর্ভুক্ত করেছিল। যেমন ১২৮১ সনে বি আর দে এন্ড ব্রাদার্স কর্তৃক প্রকাশিত 'পঞ্জিকা ও ডাইরেক্‌টরি'তে 'কলিকাতার জন্ম এবং মৃত্যুর রেজিষ্টরী' শীর্ষক পরিবেশিত তথ্যে যে অতিরিক্ত সংবাদ পরিবেশিত হয়েছিল তা হল, "কোন ব্যক্তির সন্তান ভূমিষ্ঠ হইলে অষ্টাহের মধ্যে আপন আপন ডিবিজনের থানায় রেজিষ্টারী করিতে হইবেক, এবং কাহার মৃত্যু হইলে অষ্টম দিবসের মধ্যে রেজিষ্টারী করিতে হইবেক, যে কেহ ইহা না করিবে তাহার ১০০ একশত টাকা জরিমানা হইতে পারে।"[৩২] চিঠির ডাকে ওজনের সীমাবদ্ধতা ১২ ভরি থেকে বাড়িয়ে ২৫ ভরি করা হয়েছিল। এই তথ্য 'অথ ডাকের মাসুল' শিরোনামে যেরকম ভাবে ১২৫৩ সনের 'নূতন পঞ্জিকা'য় উপস্থাপিত হয়েছিল : "চিঠীর ডাকে ২৫ পর্যন্ত পুলিন্দা পাঠানো যায়। বাঁকির দ্বারা সাড়ে সাতসের জিনিস যায়। বাঁকি অপেক্ষায় চিঠীর ডাক শীঘ্র যায়। চিঠীর ডাকে যত ভরি হয় তত গুণ মাশুল দিতে হয়। ভরির কিঞ্চিৎ অধিক হইলে আর এক ভরি গণা যায়। বাঁকিতে ৫০ ভরিতে ১ ভরি হিসাব হয়। পঞ্চাশের কিঞ্চিৎ অধিক হইলে দুই ভরি গণা যায়। ১৫ ইঞ্চ দীর্ঘ ১৩ ইঞ্চ প্রস্থ ১২ ইঞ্চ উচ্চ ইহার অধিক পুলিন্দা ডাকে লয় না।"[৩৩] উনিশ শতকে পরিবহন ব্যবস্থা কীরকম ছিল এবং পরিবহন ব্যবস্থার ক্রমবর্ধমান অগ্রগতি কীভাবে প্রভাবিত করেছিল জনজীবনকে তার নিদর্শন পঞ্জিকায় পাওয়া যায়। ১২৬৩ সনে 'কলিকাতা সেন্ডার্‌স কোন্স এবং কোম্পানীর যন্ত্রে' মুদ্রিত 'নূতন পঞ্জিকা'য় 'ইষ্ট ইন্ডিয়া রেলওয়ে কোম্পানির গাড়ির ভাড়া ও সময়ের নিরূপণ এবং নিয়মাদি' শিরোনামে কলকাতাকেন্দ্রিক রেল পরিষেবার চিত্র পাই :

গমনাকাংক্ষী লোকেরা যেন নিরাশ না হয়েন এই নিমিত্তে তাহারদিগকে গাড়ি চড়িবার নিরূপিত সময়ের অভাবগত ১০ মিনিট পূর্ব্বে স্টেশনে উপস্থিত হইতে হইবে।

লিখিত নিরূপিত ক্ষণে গাড়ি পঁহুছনের যদি কিঞ্চিৎ ব্যত্যয় হয় তার জন্য রেলওয়ে কোম্পানী দায়ী হইবেন না, ফলতঃ নিয়মরক্ষণে তাঁহারা সাধ্যানুসারে চেষ্টা করিতে কোনক্রমে ত্রুটি করিবেন না।

ডবল জার্নি অর্থাৎ এক মাত্র টিকিটে গমন ও আগমন দুই কার্য্য সম্পন্ন হইতে পারে এমত যে রিটরণ টিকিট তাহা কেবল প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীর লোকদিগকে দেওয়া যাইবেক। এবং এক টিকিটে গমন ও অন্য টিকিটে প্রত্যগমন করিতে হইলে দুই টিকিটের মূল্য যত হয় রিটরণ টিকিট তাহার তিন অংশের এক অংশ ন্যূন মূল্যে পাওয়া যাইবেক। রিটরণ টিকিটে সেইদিন বা সেই গাড়ি শ্রেণী ভিন্ন অন্যদিনে আসিতে পারিবেন না। কিন্তু শনিবারে রিটরণ টিকিট লইলে সোমবার সন্ধ্যাকাল পর্যন্ত যে কোন গাড়ি শ্রেণীতে হউক আসিতে পারিবেন।

১২ মাসের অনধিক বয়স্ক শিশুর ভাড়া লাগিবেক না। এবং দ্বাদশ বর্ষের অনধিক বয়স্ক বালকের অর্দ্ধেক ভাড়া লাগিবেক।[৩৪]

গাড়ি চলাচল সম্পর্কিত তথ্যও সুন্দর ভাবে দেওয়া রয়েছে : "মালের গাড়ির সঙ্গে প্রথম শ্রেণীর এক খানি গাড়ি মাত্র যাইবেক। প্রতি রাত্রি ৮ ঘন্টা ৩০ মিনিটের সময়ে হাবড়া হইতে গমন করিয়া ৯ ঘন্টা ২০ মিনিটে শ্রীরামপুর পঁহুছিবেক ৯ ঘন্টা ৫৫ মিনিটে বর্দ্ধমানে এবং প্রাতে ৬ ঘন্টা ৩৫ মিনিটে রানীগঞ্জে পঁহুছিবেক।"[৩৫] ব্রিটিশ শাসিত ভারতবর্ষে ব্যবসা-বাণিজ্যের সম্পর্কীয় তথ্য বাংলা পঞ্জিকার পাতাতে দেখা যায়। ব্যবসা-বাণিজ্যের স্থান, শ্রেণীবিভাগ, কার্যাবলী, নিয়ন্ত্রণ ইত্যাদি বাংলা পঞ্জিকায় পরিবেশিত হয়েছিল। ১২৭৫ সনে প্রকাশিত 'নূতন পঞ্জিকা'তে প্রকাশক 'কর্ম্মচারি ও ব্যবসায়িদিগের লাইসেন্স' শিরোনামে শ্রেণিভিত্তিক লাইসেন্স ফি সংক্রান্ত যে তথ্য তাঁর প্রকাশনায় সংযোজন করেন—"**১ শ্রেণী**। ২৫০০০ হাজার আয়ের অধিক-৫০০। **২ শ্রেণী**। ১০০০০ নাং ২৫০০০-২০০। **৩ শ্রেণী**। ৫০০০ নাং ১০০০০-১০০। **৪ শ্রেণী**। ১০০০ নাং ৫০০০-২০। **৫ শ্রেণী**। ৫০০ নাং ১০০০-১০। **৬ শ্রেণী**। ২০০ নাং ৫০০-৪। বেতনভোগী ব্যক্তিদিগের যাহাদের বাৎসরিক বেতন ১০০০ টাকা নয় তাহাদের দিতে হইবেক না।"[৩৬]

উনিশ শতকের শেষভাগ থেকে পঞ্জিকার ক্ষেত্রভূমিকে ব্যবসায়ীরা দখল করতে থাকে। ব্যবসায়ীরা লক্ষ্য করেছিল ঘরে ঘরে তাদের ব্যবসায়িক পণ্য তুলে দিতে গেলে পঞ্জিকা হল সবচেয়ে সেরা মাধ্যম। পঞ্জিকা মানুষকে বিশ্বাস করতে শিখিয়েছিল এই বই শ্রবণ করলে পুণ্য হয়। তার পৃষ্ঠাতে পরিবেশন করা বিজ্ঞাপনও সেই বিশ্বাসের জায়গাতে সুড়সুড়ি দিতে সক্ষম। তাই পঞ্জিকাতে ছোটো বড়ো সব ধরনের ব্যবসায়ীরাই পণ্য সাজিয়েছিলেন। বিজ্ঞাপনের সঙ্গে ব্যবহার করা হত ছবি। ক্রেতাদের মনে প্রভাব ফেলার জন্য ছবি হত অনেক সময় চটকদার। আর সুন্দরভাবে ভাষাপ্রয়োগে পাঠককে মোহিত করা হত। পঞ্জিকার বিজ্ঞাপনে এভাবেই উঠে আসে সমকালীন সমাজচিত্রের টুকরো টুকরো ঝলক। পঞ্জিকাতে সবরকমের বিজ্ঞাপনই ছিল, আয়ুর্বেদ ডাক্তারি, আয়ুর্বেদ ঔষধ, যৌনরোগের সমস্যা, চুলের তেল, ম্যাজিক লণ্ঠন, বন্দুক, প্লানচেট, কালীঘাটের পট, রবিবর্মার লিথোছবি, বই, ঘড়ি, তাবিজ এবং আরও হাজারো রকমের পণ্যের বিজ্ঞাপন। সে সময় বহু মানুষ বিনা চিকিৎসায় মারা যেত, সুচিকিৎসার সুযোগ তাদের ছিল না। তাই একমাত্র ভরসা ছিল কবিরাজী চিকিৎসা এবং তার ঔষধ। পঞ্জিকাতে ভুরি ভুরি কবিরাজী বিজ্ঞাপন দেখা যেত চিকিৎসা, ঔষধ বিষয়ে। ১৯০৪-০৫ খ্রিস্টাব্দে বেণীমাধব দে অ্যান্ড কোং এর 'নূতন পঞ্জিকা'তে 'শিবশক্তি বটীকা'র বিজ্ঞাপনে বিবরণ পাই, "জ্বরের ব্রহ্মাস্ত্র।... ম্যালেরিয়া বিষ নাশ করিতে অব্যর্থ মহৌষধ। শিবশক্তি বটীকা—নূতন পুরাতন জ্বর আরোগ্য করিতে, জীর্ণ জটিল প্লীহা যকৃত-সংযুক্ত

জ্বর নাশ করিতে ম্যালেরিয়া দূর করিতে, এই জগৎবিখ্যাত শিবশক্তি বটীকার ন্যায়, সর্বজ্বর নাশক ঔষধ এ পর্য্যন্ত আবিষ্কৃত হয় নাই।"[৩৭] এই বিজ্ঞাপনের ছবিতে দেখি কঙ্কালসার একজন শয্যাশায়ী পুরুষকে সেবা করছে একজন রমণী এবং দরজার নিকটে বটীকা হাতে শিব। পঞ্জিকায় আর এক শ্রেণির বিজ্ঞাপন বেশ চোখে পড়ে, সেটা হল যৌনরোগ ও তার ঔষধ। মানুষের যৌন অঙ্গের শক্তি ও সুষমা বৃদ্ধি করার ইচ্ছা মজ্জাগত। চাহিদা লক্ষ্য করেই, পুরুষের জীবনকে আনন্দময় এবং বহুনারী গমনে শক্তিশালী করার প্রতিশ্রুতি এইসব বিজ্ঞাপনে দেওয়া হত। বেণীমাধব দে অ্যান্ড কোং এর 'নূতন পঞ্জিকা'তে রতিবর্দ্ধক বটীকার বিজ্ঞাপনে বিবরণ পাই, "প্রমদা প্রসঙ্গে অশ্বের ন্যায় শক্তি প্রদান করিতে রতিবর্দ্ধক বটীকার অসাধারণ শক্তি। প্রমদা প্রসঙ্গাভিলাষী ব্যক্তিদিগের এই মহৌষধ মনের ইচ্ছা পূর্ণ করিতে পরম আদরের ধন।"[৩৮] ১৯০৫-০৬ খ্রিস্টাব্দে পি এম বাক্‌চির পঞ্জিকায় 'রতিবিজয়ী বটিকা' বা 'শ্রীমদনানন্দ মোদক' এরও ভূমিকা একই। পি এম বাক্‌চি'র (১৯০৮) পঞ্জিকা'য় 'এম্পায়ার নার্সারী' ৪ নং উল্টো ডাঙা মেন রোড, কলকাতা, বাঁধাকপি এবং শালগমের ছবি দিয়ে তাদের বীজের বিশদে বর্ণনা দিয়েছেন।[৩৯] গুপ্ত প্রেস (১৯০৪-০৫) পঞ্জিকায় রানী ভিক্টোরিয়ার মুখাবয়ব সমন্বিত ভিক্টোরিয়া টুথ পাউডার সুবাসিত দন্ত মাঞ্জনের বিজ্ঞাপন, ভারত সম্রাজ্ঞীর ছবি দিয়ে বিলাতি অনুষঙ্গ যুক্ত করে তাদের পণ্যকে অনন্য মহিমা দান করেছেন, এই বিলাতি মোড়ক জনসাধারণকে টানবে।[৪০] গুপ্ত প্রেস (১৮৯৬) পঞ্জিকাতে একটি বিজ্ঞাপন দেখি 'বাবুসজ্জা' বিষয়ে। একজন পুরুষকে বাবু সাজতে গেলে যে যে উপকরণের প্রয়োজন হয় এবারে এক জায়গাতেই সব মিলবে। এই সমস্ত জিনিস থাকলে তিনি একেবারে সেজেগুজে বাবু হয়ে উঠবেন। কলিকাতার মিত্র ব্রাদার্স ঘোষণা করেছে তাঁরা মাত্র সাড়ে তিন টাকায় প্রদান করবে 'বাবুসজ্জা', বিজ্ঞাপনে তার বিবরণ :

(ঘড়ি চেন আর প্রভৃতি ১৫ পনের রকম প্রয়োজনীয় জিনিস)

১। দুই বৎসরের গ্যারান্টি স্বতন্ত্র কেশ (বাক্স) সহ একটা উৎকৃষ্ট ঘড়ি। ২। আসল কেনেডিয়ান স্বর্ণের সুন্দর চেন হার ১ ছড়া। ৩। ওই স্বর্ণে স্বতন্ত্র ঘড়ির চেইন ১ ছড়া। ৪। ঐ লকেট (দিক নির্ণয় যন্ত্র) ১ টি। ৫। ঐ স্বর্ণের সুন্দর শার্ট বোতাম ১ সেট। ৬। অস্ট্রিয়ান হিরা, চুনি বা পান্না বসানো আংটি ১ টি। ৭। ফ্যান্সি পাড়দার রুমাল ১ খানা। ৮। সুগন্ধি বিলাতী খোসবই ১ শিশি। ৯। ঐ রিমেল সাবান ১ টি। ১০। বিলাতী হ্যান্ডেলওয়ালা আয়না ১ খানা। ১১। ঐ নকশা কাটা হেয়ার কুম্ব (চিরুনী) ১ খানা। ১২।১৩।১৪। স্টেশনরি হোল্ডার অর্থাৎ পেন, পেনসিল, রাবার একত্র ৩ টি। ১৫। ব্লু ব্ল্যাক পাউডার কালী ১ প্যাক। ডাক মাশুল ১২ আনা স্বতন্ত্র লাগে।

গের সুবাসিত চুলের কলপ। ইহা লাগাইতে কোনও কষ্ট হয় না, গন্ধে চারিদিক আমোদ করে। লাগাইলে কেশ গাঢ় কৃষ্ণবর্ণ হয়। মূল্য ১২ আনা ডা. মা. ৪ আনা।[৪১]

পরিশেষে বলা যায়, এদেশে এককালে কালবিভাগ বা বর্ষপঞ্জি রচনার প্রেরণা এসেছিল যাগযজ্ঞের কাল নির্ণয়ের জন্য। তারপর কয়েক হাজার বছরের সময়ান্তরে জ্যোতির্বিদ আর্যভট্ট, ব্রহ্মগুপ্ত, বরাহমিহির প্রমুখের হাত ধরে সূক্ষ্ম গণনাপদ্ধতির উদ্ভব ঘটে। সূর্যসিদ্ধান্তের পদ্ধতিতে গণনা করে বার, তিথি, নক্ষত্র, যোগ ও করণযুক্ত পঞ্চাঙ্গ বা পঞ্জিকা আচার-অনুষ্ঠানের তিথিক্রমের বিধান হয়ে ওঠে। পঞ্জিকা মুদ্রিত হওয়ার পূর্বে দৈবজ্ঞরা হাতে লেখা তালপাতার পুঁথি নিয়ে গ্রামে গ্রামে বছরের প্রারম্ভে কিংবা পক্ষ শেষে পঞ্জিকা শুনিয়ে আসত। আর তার থেকেই জনসাধারণ জানতে পারত কী বারে একাদশী, কী বারে অমাবস্যা, পূর্ণিমা, কী বারে কী পুজো, কোন ব্রত ইত্যাদি। জন্মের পর থেকে বিদ্যারম্ভ, উপনয়ন, বিবাহ, যাত্রা, রোগ, শ্রাদ্ধ প্রভৃতি সব জায়গাতেই শুভ-অশুভ নির্দেশের জন্য আহ্বান করা হত দৈবজ্ঞদের। পঞ্জিকার ভূমিকা অপরিসীম ছিল সামাজিক এবং পারিবারিক ধর্মীয় অনুষ্ঠান সম্পন্ন করার কাজে। শাসক ব্রিটিশদেরও প্রয়োজন পড়েছিল

পঞ্জিকার, রাজকার্য পরিচালনা, ছুটির দিন ঘোষণার জন্য। দেখা গেল বাংলা পঞ্জিকার সংস্কারের ক্ষেত্রে ব্রিটিশ শাসকদেরও অবদান রয়েছে, এবং সেই সূত্রেই রাজা কৃষ্ণচন্দ্র হয়ে গেলেন বাংলা পঞ্জিকার প্রথম পৃষ্ঠপোষক। পঞ্জিকা যতদিন হাতে লেখা ছিল তখন পঞ্জিকার ভেতরে বিষয়ের বৈচিত্র ছিল না। কিন্তু পঞ্জিকা মুদ্রিত হওয়ার পর থেকে জ্যোতিষবচনাদির সঙ্গে সঙ্গে জনসাধারণের প্রয়োজনীয় বহু তথ্য সংযোজিত হতে থাকে। এভাবে পঞ্জিকা একটি গণমাধ্যমের বড়ো ভূমিকা হয়ে উঠেছিল। কারণ ঔপনিবেশিক পর্বে শহর থেকে গ্রামে অগণিত মানুষের নিকটে স্বাস্থ্য পরিষেবা, পরিবহন ব্যবস্থা, ডাক ও তার পরিষেবা, নিবন্ধনের স্থান ও নিয়মাবলী, ব্যবসা-বাণিজ্যের স্থান ও নিয়মাবলী, ব্যাংক ও বীমা পরিষেবা, কর-শুল্ক, বিচারব্যবস্থা ইত্যাদি বিষয় সম্পর্কিত বহু তথ্য পঞ্জিকা পৌঁছে দিয়েছিল। মানুষকে সচেতন করার বা জনশিক্ষার এই কর্মসূচিতে পঞ্জিকার ভূমিকা অবশ্যই উল্লেখযোগ্য। জোড়াসাঁকো নিবাসী দুর্গাপ্রসাদের কথাতে পাওয়া যায় তিনি সম্পদের বাসনা করে পঞ্জিকা প্রকাশ করেছিলেন, পঞ্জিকার প্রকাশনা যে লাভজনক ছিল তাতে কোনো সন্দেহ নেই কারণ বছরে বছরে বহু নতুন পঞ্জিকা প্রকাশিত হয়েছিল। লাভজনক না হলে এত লোক ব্যবসায় উদ্যোগী হত না। এমনকি বিদেশি কোম্পানিও পঞ্জিকা মুদ্রণের কাজে প্রলুব্ধ হয়েছিল। পঞ্জিকার গ্রহণযোগ্যতা সমাজের সর্বস্তরে ছিল তাই ব্যবসায়ীরা তাদের পণ্যের বিজ্ঞাপনের পসরা সাজিয়েছিল পঞ্জিকাতে। বিক্রয়যোগ্য এমন কোনো বস্তু হয়তো ছিল না যার বিজ্ঞাপন পঞ্জিকার পাতাতে হয়নি। পঞ্জিকার আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ জায়গা হল ছবি, সর্বপ্রথম প্রকাশিত বাংলা পঞ্জিকাতেও ছবির উল্লেখ ছিল, পরে দেশীয় শিল্পীদের তৈরি করা হিন্দুদের দেবদেবী এবং ধর্মীয় অনুষ্ঠানের ছবি পঞ্জিকায় পরিবেশিত হয়েছিল যা জনসাধারণের খুব আদরের সামগ্রী ছিল। সব মিলিয়ে বলতে হয় গত দুই শতকের বাঙালি জীবনের তথ্য অনুসন্ধানের ক্ষেত্রে তার আনাচ-কানাচ বিশ্লেষণের জন্য বাংলা পঞ্জিকা অমূল্য দলিল।

তথ্যসূত্র

১। নির্মল চন্দ্র লাহিড়ী, “পঞ্জিকা”, ভারতকোষ, ৪র্থ খণ্ড (কলকাতা : বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ, ১৯৭০), পৃ. ২৮৪।

২। নিলয়কুমার সাহা, বাংলা পঞ্জিকা : দুশো বছরের আলোয় গণ-জ্ঞাপন ও বিজ্ঞাপন (কলকাতা : সেতু, ২০১০), পৃ. ৫-৭।

৩। লাহিড়ী, “পঞ্জিকা”, পৃ. ২৮৪।

৪। তদেব, পৃ. ২৮৫।

৫। চিত্তরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়, বঙ্গ প্রসঙ্গ (কলকাতা : পুস্তক বিপণি, ১৯৬০), পৃ. ৩৮-৩৯।

৬। গৌতম ভদ্র, ন্যাড়া বটতলায় যাই ক’বার? (কলকাতা : ছাতিম বুকস্, ২০১১), পৃ. ৪০৮।

৭। “পঞ্জিকা”, বিশ্বকোষ, সঙ্ক. নগেন্দ্রনাথ বসু, ১০ম খণ্ড (স্বপ্রকাশিত, ১৩০৬), পৃ. ৬৫১।

৮। অতুল সুর, বাংলা মুদ্রণের দুশো বছর (কলিকাতা : জিজ্ঞাসা, ১৩৮৫), পৃ. ৩৯।

৯। বন্দ্যোপাধ্যায়, বঙ্গ প্রসঙ্গ, পৃ. ৪২।

১০। তদেব।

১১। সুর, বাংলা মুদ্রণের দুশো বছর, পৃ. ৩৮-৩৯।

১২। বন্দ্যোপাধ্যায়, বঙ্গ প্রসঙ্গ, পৃ. ৪২-৪৩।

১৩। তদেব, পৃ. ৪৩।

১৪। শঙ্কর সেনগুপ্ত, পাদরী লঙ, বাংলা সাহিত্য ও বাঙালী জীবন (কলকাতা : ইন্ডিয়ান পাবলিকেশনস, ১৯৬০), পৃ. ১৭২।

১৫। বন্দ্যোপাধ্যায়, বঙ্গ প্রসঙ্গ, পৃ. ৪৭।

১৬। তদেব, পৃ. ৪৩-৪৪।

১৭। সাহা, বাংলা পঞ্জিকা : দুশো বছরের আলোয়, পৃ. ১৬।

১৮। বন্দ্যোপাধ্যায়, বঙ্গ প্রসঙ্গ, পৃ. ৪৭।

১৯। সাহা, বাংলা পঞ্জিকা : দুশো বছরের আলোয়, পৃ. ১৭।

২০। প্রবীর সরকার, "কৃষ্ণচন্দ্র কর্মকার", *বাংলা মুদ্রণ ও প্রকাশন*, সম্পা. চিত্তরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায় (কলিকাতা : বসুমতী সাহিত্য মন্দির, ১৯৮১), পৃ. ৮৬।

২১। তদেব, পৃ. ৮৬-৮৭।

২২। তদেব, পৃ. ৮৭।

২৩। বন্দ্যোপাধ্যায়, বঙ্গ প্রসঙ্গ, পৃ. ৪৭।

২৪। তদেব, পৃ. ৪৮-৪৯।

২৫। সাহা, বাংলা পঞ্জিকা : দুশো বছরের আলোয়, পৃ. ১৯।

২৬। তদেব, পৃ. ২০।

২৭। নিলয়কুমার সাহা, "বঙ্গজীবনে বাংলা পঞ্জিকা এবং বিতর্ক", *পঞ্জিকা : ইতিহাস ও বিবর্তন*, সম্পা. অর্জুন দেবশর্মা ও অনিল আচার্য (কলকাতা : অনুষ্টুপ, ২০২৩), পৃ. ৫৭।

২৮। বন্দ্যোপাধ্যায়, বঙ্গ প্রসঙ্গ, পৃ. ৫০-৫১।

২৯। সাহা, বাংলা পঞ্জিকা : দুশো বছরের আলোয়, পৃ. ২৪।

৩০। তদেব, পৃ. ২৪-২৬।

৩১। হিমাদ্রী শেখর হাওলাদার, "বাংলা পঞ্জিকা একটি সংস্কৃতির দলিল", *পঞ্জিকা : ইতিহাস ও বিবর্তন*, সম্পা. অর্জুন দেবশর্মা ও অনিল আচার্য (কলকাতা : অনুষ্টুপ, ২০২৩), পৃ. ১৪০-১৪১।

৩২। নিলয় কুমার সাহা, সম্পা., বাংলা পঞ্জিকায় পুরনো কলকাতা (কলকাতা : সেতু, ২০২২), পৃ. ১৪০।

৩৩। তদেব, পৃ. ১২২।

৩৪। তদেব, পৃ. ৫২-৫৩।

৩৫। তদেব, পৃ. ৫৩।

৩৬। তদেব, পৃ. ১৫১।

৩৭। অসিত পাল, আদি পঞ্জিকা দর্পণ, ১ম সং (কলকাতা : সিগনেট, ২০১৮), পৃ. ১০১।

৩৮। তদেব, পৃ. ১০০।

৩৯। তদেব, পৃ. ২০৯।

৪০। তদেব, পৃ. ২০৭।

৪১। তদেব, পৃ. ১২৮।